বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের সর্বোত্তম আদর্শ

হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রুহুল আমীন খান

বিশ্বজগতের সবারই পরম আরাধ্য ও কাম্য শান্তি। শান্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলের। প্রয়োজন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিস্ময় সাধিত হয়েছে সেই সাথে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ভয়াবহ মারণাস্ত্রেরও। স্তূপীকৃত হয়েছে সভ্যতা বিধ্বংসী এমন সব যুদ্ধাস্ত্র যার প্রয়োগে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাই হয়ে যেতে পারে ধ্বংস নিশ্চিহ্ন। এজন্য শান্তির প্রয়োজন এ সময়ে সর্বাধিক। কিন্তু কী উপায়ে আসবে পরম আরাধ্য সেই শান্তি ও কল্যাণ এটাই বড় জিজ্ঞাসা।

শান্তির জন্য চেষ্টাতো কম হচ্ছে না। চলছে চিন্তা গবেষণা, গড়ে উঠেছে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন, চলছে অবিরাম তৎপরতা। তবু শান্তির সোনার হরিণ অধরাই থেকে যাচ্ছে। আসলে বস্তুগত শক্তির সাথে আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় না ঘটলে, ইহকালীন কার্যাবলীর জন্য পরকালীন জবাবদিহির চেতনা জাগ্রত না হলে মানবতা ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধিত না হলে, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া না হলে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে এই বিশ্বজগতের যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক, সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কেবল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সৃষ্টিজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিরাজমান থাকার এক চিরন্তন ব্যবস্থাও করেছেন এবং সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে যুগে যুগে পৃথিবীতে তাঁর মনোনীত দূতদেরও পাঠিয়েছেন, তারা হচ্ছেন নবী-রাসূল। মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে তারা প্রেরিত হয়েছেন, মানবমন্ডলীকে শুনিয়েছেন শান্তি ও কল্যাণের মহাবাণী। এদের সংখ্যা এক বর্ণনা মতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার। মানব জাতির কল্যাণ সাধন করে গেছেন তাঁরাই। চারিত্রিক উৎকর্ষতা, আত্মার-পরিশুদ্ধতা কল্যাণ কার্যাবলীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তারাই। তাঁরা নিজ নিজ সময়ে সৎকাজের উপদেশ দিয়েছেন, ন্যায়-সত্য, ইনসাফ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং পরবর্তীদের জন্যও রেখে গেছেন মুক্তি ও কল্যাণের রাজপথ। আজও দুনিয়ায় যেখানে যতটুকু নৈতিকতা পরিচ্ছন্নতা, মানবিকতা, শান্তি ও কল্যাণ দৃশ্যমান তা তাদেরই প্রচেষ্টার ফসল। তাদেরই শিক্ষার বদৌলতে আজও এই পৃথিবী বসবাসযোগ্য। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী–রাসূলগণের আগমনের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ রাসূল হলেন সৃষ্টির সুন্দরতম মহোত্তম, শ্রেষ্ঠতম রাসূল হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আমাদের জাতীয় কবির ভাষায় :

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন
এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাহি কহিল যে জন
মানুষের লাগি চিরদিন হীন বেশ ধরিল যে জন
বাদশা ফকীরে এক শামিল করিল যে জন
এলো ধরায় ধরাদিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
আজি মাতিল বিশ্ব নিখিল তাই মুক্তির কলরোলে।
মহাকবি শেখ সাদীর ভাষায় :
বালাগাল উলা বি কামালিহী– কাশাফাদ্দোজা বি জামালিহী।
হাসুনাত জামিউ খিসালিহী– সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।
– সবার ঊর্ধ্বে, সবার শীর্ষে পূর্ণতায়
তিমির আঁধার বিদূরিত যার জ্যোতি– আভায়
পূত অনুপম মধুময় চারু স্বভাব যার
সালাম সালাম সে নবী এবং স্বজনে তাঁর।
তিনি প্রতিশ্রুত, প্রার্থিত, প্রতীক্ষিত। সব নবী– রাসূলের সকল গুণ তার মাঝে সমাবেশিত।
তুমি ঈসার মুযেযা ত্যাগ খলীলের
তুমি কুরবানী বীর নবী ইসমাঈলের
তুমি প্রার্থনা নবীপিতা খলীলুল্লাহর
তুমি আইয়ূবের ধৈর্য ও সাহস মূসার।

মানুষের মনোজগতে তিনি এনেছিলেন এক মহাবিপ্লব। দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জনগোষ্ঠীকে তিনি পরিণত করেছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে। দুনিয়ার নিকৃষ্ট এক সমাজকে পরিণত করেছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে। সাম্য মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফের সেই সমাজের নজীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। জুলম অত্যাচার, শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন শান্তি ও কল্যাণের এক মহান সমাজ। ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, দেশে দেশে সমঝোতা ও সুসম্পর্কের বুনিয়াদ তিনি স্থাপন করে গেছেন, উপাদান তিনি রেখে গেছেন। তাই তিনি হচ্ছেন বিশ্বমানবের পথের দিশারী বিশ্বশান্তির সর্বোত্তম আদর্শ।

ঈমান ও ইসলাম

বিশ্বনবী (সা.) মানুষদেরকে ইমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটি আমান ও সালাম ধাতু থেকে নিগৃত। এর মৌল অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সর্বস্তরে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম তিনি শুনিয়েছেন, নিশ্চয়তার বিধান তিনি করেছেন। মানবী ঐক্যের মহাবাণী তিনি শুনিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, রক্তধারার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অহংকার, বর্ণগত, বংশগত, ভাষাগত, অহঙ্কার, মানবসৃষ্ট বিভেদ বৈষম্য, মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভাজনই ডেকে এনেছে অনেক অশান্তি, বেজে ওঠেছে রণদামামা, সংগটিত হয়েছে অনেক যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ। বিধ্বস্ত হয়েছে শহর জনপদ। বয়ে গেছে কত না রক্তের দরিয়া। বিধবা, এতিম, অনাথের হাহাকারে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, মানুষের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। বিষাক্ত হয়েছে আবহাওয়া বিশ্বশান্তি মহান দিশারী বিশ্বনবী (সা.) ঘোষণা করেছেন– সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুনিয়েছেন আল্লাহর মহাঘোষণা, 'ইয়াআইয়ুহান্নাস ইন্না খালাক না কুম মিন যাকারিউ ওয়া উনসা, ওয়া জায়ালনাকুম, শুভ বাওঁ ওয়া কাবায়িলা লি তা আ'রাফু। ইন্না আকরামুকুম ইনদাল্লাহি আতকামুম।'

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একই পুরুষ ও একই নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে, যাতে তোমরা একে অপরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সম্মানী ও মর্যাদাবান যেজন অধিক মোত্তাকী ও পরহেজগার।'।

বিশ্বনবী বিদায় হজ্বের ভাষণে বললেন,

'চরণে দলিনু অন্ধ যুগের বংশ অহংকার'।

তিনি ঘোষণা দিলেন 'লাইসা লিল আরাবিয়ে ফাদলুন আলাল আজামীয়্যে, ওয়ালা লিল আজামিয়্যে ফাদলুন আলাল আরাবিয্যে, কুল্লুকুম আবনাউ আদা ওয়া আদামু মিন তুরাব'।

অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।

"ধূলায় রচিত আদম তনয় গর্ব কিসের তার'।
নহে আশরাফ আছে যার শুধু বংশের পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

বৈষম্যের অবসানে

কেন বংশগত বৈষম্য? সবাইতো এক আদমের সন্তান। সাদা হোক, কালো হোক, লাল হোক, হলুদ হোক, আর্য হোক অনার্য হোক, আরব হোক অনারব হোক সকলের উৎস এক, মূল এক।

কেন দেশগত বৈষম্য? লাহুমুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। 'লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ।' আলমে নাসুত, আলমে মালাকুত, আলমে জাবারুত– এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জের মহাকাশ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য লোক, অতিন্দ্রিয় লোক, এই সাগর, পাহাড়, মরুবিয়াবান, শস্য, শ্যামলার বৈচিত্র্যে ভরপুর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় বিভক্ত, ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই সুন্দর বসুন্ধরা এবং সব মিলে যে মহাজগৎ মহাবিশ্ব এর একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক তো একমাত্র আল্লাহর।

কোনো ভাষাকে কেন তুচ্ছভাবা? সব ভাষাইতো ওই মহাপ্রভুরই দান, ওই মহামহিমেরই নিদর্শন।

"ওয়ামিন আয়াতিহী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলা ফি আলসি নাতিকুম ওয়া আলা ওয়া নিকুম।"

'খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান।'

বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু, ফার্সি, হিব্রু, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মেন সকলই আল্লাহর দেয়া। তাই ভাষা হিসাবে একের ওপর অন্যের প্রাধান্য দাবী করা এককে মর্যাদাবান মনে করার কোন মৌলিক ভিত্তি নেই।

সাম্য-মৈত্রী ঐক্য

বিশ্ব শান্তির জন্য মানুষে মানুষে সাম্য চাই, মৈত্রীর বন্ধন চাই, সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ে বৃহত্তর ঐক্য চাই। আর এক্ষেত্রেও বিশ্বনবীর অবদান যে অপরিমেয় ইতিহাস ও তার সাক্ষী। তার প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল এক মহাসাম্যের সমাজ। আচারে-আচরণে, ইবাদতে বন্দেগীতে, বিচারে-ইনসাফে কোন কিছুতে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়নি। মহানবী সবাইকে নিয়ে এসেছেন একই সমতলে। ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতের মধ্য দিয়েও দেওয়া হয়েছে সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের তালীম। সামাজিক অবস্থান যাই হোক সবার জন্য একই রূপ সিয়াম সাধনা। সবাই একই ইমামের পেছনে একই কাতারে। একজন দীনমজুর শ্রমিক আগে আসলে দাঁড়াবে সামনের সারিতেই আর রাষ্ট্রনায়ক, সম্রাট, রাজা-বাদশা, আল্লামা, মনীষী, যিনিই হোন না পরে আসলে ওই শ্রমিকের পেছনের সারিতে দাঁড়াবে।

একহি সফমে খাড়ে হোগ্যায়ে মাহমুদ ও আয়ায
নাহ কুইবান্দারাহ আওর না কুই বান্দা নেওয়ায।

হজ্বের আনুষ্ঠানিকতাসমূহের মধ্য দিয়ে সাম্যের কী অপূর্ব দৃশ্যই না ফুটে ওঠে। এক কাবাকে কেন্দ্র করে সব বর্ণ, ভাষা, মর্যাদার মানুষ করছে তাওয়াফ, একই সাথে একই নিয়মে করে যাচ্ছে সাফামারওয়ার সায়ী।

আর আরাফাতের দৃশ্যের তো কোন তুলনাই হয় না। ঊর্ধ্বে একই নীল আকাশ, পদতলে একই বালু কঙ্করময় ময়দান, সাদা-কালো, পীত-হলুদ-লাল সব রঙের মানুষের দুনিয়ার সকল ভাষার লোক, বাদশা-ফরি দুনিয়ার সব পদ মর্যাদার লোকদের পরিধানের একই ধরণের সেলাইবিহীন শ্বেত শুভ্র বসন, সবার কণ্ঠে একই ধ্বনি লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক– প্রভূ হে তোমার বান্দা হাজির তোমার দরবারে... এই বিশ্ব সম্মেলনের এমন বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে এই পৃথিবীও হতে পারে শান্তির পৃথিবী।

প্রিয় নবী (সা.)-এর শিক্ষা হচ্ছে মানুষ হিসেবে সকলের সমান, কর্মের মাধ্যমেই নিরূপিত হবে তার মর্যাদা। এক সময়ের কাফ্রী, ক্রীতদাস কৃষ্ণাঙ্গ বেলাল মসজিদে নববীর সম্মানীত মুয়াজ্জিন, এককালীন ক্রীতদাস যায়েদ যুদ্ধের সেনাপতি, তার পুত্র উসামা ইবনে যায়েদ আরেক অভিযানের সমর নায়ক। আল্লাহর দেয়া পানিতে, বায়ুতে, সূর্য রশ্মিতে চাঁদের আলোকে যেমন সবার অধিকার বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রচারিত আদর্শ ও দ্বীনেও সব কিছুতে তেমন দেয়া হয়েছে সবাইকেই সমান সুযোগ, সমঅধিকার। এজন্যই ইসলাম সাম্যের ধর্ম, শান্তির ধর্ম, নিরাপত্তার ধর্ম, ঐক্যের ধর্ম, সমঅধিকারের ধর্ম, সার্বজনীন বিশ্বধর্ম।

পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্মের প্রতি উদারতা

বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত 'মদীনা সনদ' দুনিয়ার প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। এই সনদকে লীগ অব নেশনস, জাতিসংঘ, আটলান্টিক সনদ, ডিকলারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এর প্রেরণা বলেও আখ্যায়িত করা হয়। আমরা সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী' থেকে সনদটির সার কথা তুলে ধরছি :

"মদীনার ইহুদি, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদি, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে। কেহই কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহই হযরত মুহম্মদের বিনা অনুমতিতে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ ও রাসূলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের কোন শত্রুর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। মদীনা নগরীকে পবিত্র মনে করিবে এবং যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদীনা আক্রমণ করে তবে তিন সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিবে। নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী

হইলে তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা হইবে। সে যদি আপন পুত্র হয়, তবুও তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না। এই সনদ যে বা যাহারা ভঙ্গ করিবে, তাহারা বা তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (ইহাই হইল সনদের সারমর্ম)।

মহানবী (সা.) সত্যের বাণী প্রচার করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু সত্য গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করেননি, কার ওপর জোর জবরদস্তি করেননি। পবিত্র কুরআন বলছে– ধর্মগ্রহণের ব্যাপারে নেই কোন জোর জবরদস্তি। তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। ইসলামের নীতি হলো প্রচার করে যাওয়া, যার ইচ্ছা মানবে, যার ইচ্ছা মানবে না। এটাই ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের মূলনীতি। মেরে কেটে নগর-জনপদ ধ্বংস, বিধ্বস্ত করে কোন মতবাদ-নীতিবাদ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। এটা ফ্যাসিবাদ, ইসলাম এর ঘোর বিরোধী।

শান্তির মহান দূত প্রিয় নবী (সা.) ইসলামের মহাশত্রুর সঙ্গেও কোন দিন দুর্ব্যবহার করেননি, কাফির-মুশরিকদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করেছেন। তাদের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, সে অবস্থায়ও তাদের অভিশাপ দেননি। ওহুদের যুদ্ধে যখন প্রিয় নবী (সা.)-এর ডানপাশের ৪নং দাঁতটি শহীদ হয়ে গেল এবং তার চেহারা মোবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সাহাবায়ে কেরাম তখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন, ইহা, রাসূলাল্লাহ আপনি তাদের বদদোয়া করুন। দয়ার নবী উত্তরে বললেন, আমি বদদোয়া-অভিশাপ দেয়ার জন্য প্রেরিত হইনি, আমি এসেছি আহ্বানকারী হিসেবে। শান্তি ও কল্যাণের প্রতিভূ হিসেবে। ঐ শত্রুদের জন্য এই বলে দোয়া করলেন, – প্রভূ হে, তুমি আমার সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করো, তারা জানে না, বোঝে না। (শিফা)

প্রিয় নবী (সা.) ইহুদি-ক্রিস্টানদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করেছেন। তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। নজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে আলোচনার জন্য মদীনায়ে তাইয়্যেবায় আগমন করল, তখন তিনি তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আলোচনা চালালেন, তাদের প্রার্থনার সময় হলে মসজিদে নববীতে তাদের প্রার্থনা করার জন্য জায়গা করে দিলেন।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও ধর্মগ্রন্থের সত্যায়ন

যদি এ দাবি করা হয় যে, আমি নিয়ে এসেছি যে বাণী, প্রচার করছি যে ধর্ম একমাত্র তাই সত্য, অন্যগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। ওসব অলিক অসার– তা হলেই উদ্ভব হয় অশান্তির, অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘাত-সঘর্ষ। বিশ্বনবী (সা.) এমন কথাতো বলেনইনি, বলেছেন ঠিক এর উল্টো কথা। তাঁর কথা হলো– আমি যে মহাসত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছি তা নতুন কিছু নয়; সকল নবী-রাসূল আগমন করেছেন একই পয়গাম নিয়ে। তারা সবাই ছিলেন সত্য। তাদের নিকট অবতীর্ণ সকল কিতাব ও সহীফাই সত্য। শুধু তাই নয়, মুসলমান হতে হলে তার জন্য এটা, বিশ্বাস করা, এর ওপর ঈমান রাখা অপরিহার্যও বটে। মুমিন-মুত্তাকীনের সংজ্ঞায় পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুত্তাকীন তারাই, যারা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে (হে নবী) আপনার ওপর এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর। "ওয়াল্লাযীনা আমানু বিমাউন্যিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন কাবলিকা।"

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অন্যত্র বলেছেন :

আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মিররাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহি; লা-নুফার্রিকু বাইনা আহাদিম্ মির রুসূলিহী, ওয়া ক্বালু সামিইনা ওয়াতা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।"

"ঈমান এনেছেন রাসূল, তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর, তাঁর রবের নিকট থেকে এবং মুমিনগণও ঈমান এনেছে এর ওপর। তাদের সকলে আল্লাহর প্রতি তাঁর ফেরেশ্তাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। তারা বলে, আল্লাহ ও রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি; হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।" (সূরা বাকারা ২৮৫ ও ২৮৬ আয়াত)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "লিকুল্লি জাআ'লনা মিনকুম শিরআতা ও ওয়া মিনহাজা"– "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন :

"এবং এ হচ্ছে আমার যুক্তি-প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে দিয়েছিলাম তাঁর কওমের মোকাবেলায় (যুক্তি উপস্থাপনের জন্য)। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক প্রাজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। আর তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে, এদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এর আগে নূহকেও আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সোলায়মান, আইয়্যুব, ইউসুফ এবং মূসা ও হারুনকেও; আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত; আরও আমি সৎপথে' পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসাআ', ইউনুস ও লুতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের ওপর তাদের প্রত্যেককে। আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরলপথে পরিচালিত করেছিলাম। এ হচ্ছে আল্লাহর হেদায়েত, আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা হিদায়েত করেন।"

(সূরা আল্ ইমরান : ৮৩-৮৮ আয়াত)

সহ অবস্থানের জন্য, শান্তির জন্য, বিশ্বমানবেরা কল্যাণের জন্য, বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চাই দারতা মহানুভবতা, চাই সবার অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি দান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ইসলাম পৌত্তলিকার , মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিষেধ করা হয়েছে তাদের দেব-দেবীদের গালি-গালাজ করতে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

"অলা তাসুব্বুল্লাজিনা ইয়াদউনা মিন দূনিল্লাহি, ফাসাব্বুল্লাহা আছ আম বিগাইরি ইলমিন"– "তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি-গালাজ করোনা, নইলে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকেও তারা গালি-গালাজ করবে।" (আনআম : ১০৮)

সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

"অলা ইয়াজারি মান্নাকুম শানানু কাউমিন আলা-আল্লা-তা'দিলু, এ'দিলু।"

"(মনে রাখবে বিশেষ) কোন সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ থেকে সরে আসবে; তোমরা ইনসাফ করো।"

দেশের মধ্যে কোন প্রকারে যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয়, যেন সৃষ্টি না হয় অশান্তির আবহাওয়া সে জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; "ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লা-ইয়াসখার কাইমূন মিন কাউমিন"– "হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যকার কোন সম্প্রদায় যেন অন্যকোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রুপ না করে।' (হুজরাত : ১১ আয়াত)

বিশ্ব শান্তির মহোত্তম আদর্শ বিশ্বনবী (সা.) এই নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়িত করে সর্বকালের মানবমন্ডলীর জন্য দিয়ে গেছেন পথের দিশা।

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। মানবগণ তাঁর থেকেই এসেছে এবং প্রত্যাবর্তন করতে হবে তারই কাছে। জবাবদিহি করতে হবে তারই হুজরে সকল কৃত কর্মের। তাই সবাইকে আদায় করতে হবে আল্লাহর হক। তেমনি মানুষ স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি, স্বয়ং আল্লাহর প্রতিনিধি। আর সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর এই মহাপরিবারের প্রতি রয়েছে মানুষের কর্তব্য। যেমন আল্লাহর হক রয়েছে তেমনি রয়েছে বান্দার হক। এই উভয় হক যিনি পালন করেন তিনিই হচ্ছেন সত্যিকার মানুষ। এই উভয় হক যথাযথবাবে পালন করার উপর নির্ভর করে ইহ ও পরকালের সাফল্য। নির্ভর করে সত্যিকার শান্তি। প্রিয় নবী (সা.) একদিকে যেমন আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন করেছেন, পথ নির্দেশ দিয়েছেন অপরদিকে তেমনি বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারেও আরোপ করেছেন সীমাহীন গুরুত্ব। পিতা-মাতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, ভাইবোনের হক, পুত্র কন্যার হক, প্রতিবেশীর হক, ইয়াতিম মিসকীন, অনাথ অসহায়ের হক ইত্যাদি প্রত্যেকের হক সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন। সতর্ক করে গেছেন ও সকলের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। প্রকৃত শান্তি, বিশ্বশান্তি নির্ভর করে এ সকল হক আদায় ও প্রতিষ্ঠার ওপর। বিশ্বনবী (সা.) মানব জাতির মহান শিক্ষক হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে, প্রতিষ্ঠা করে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। তাই তো তিনি বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের সর্বোত্তম আদর্শ।

আজকের মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। চন্দ্র বিজয় করেছে, গ্রহ থেকে প্রহান্তরে পাড়ি দিতে চলছে তবু এ পৃথিবীতে জ্বলচে দাউ দাউ করে অশান্তির দাবানল।

তবু–
এখানে এখানো নিপীড়িত লাখো দুর্গতদের সারি
এখানে এখনো বঞ্চিত ভূখা মানুষের আহাজারি
এখানে এখনো বিধবা, এতীম শিশুর আর্তনাদ
এখানে এখনো জুলুমের আর শোষণের শত ফাঁদ
আকাশ বাতাস বিষবাষ্প ও বারুদ গন্ধ ভরা
মহাপ্রলয়ের দ্বারদেশে আজ হাজির বসুন্ধরা
চাই না প্রলয়, ধ্বংসযজ্ঞ হানাহানি আর রণ
বিশ্ব শান্তি কায়েমে হে নবী তোমার আজ প্রয়োজন।

[নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব]